জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার কৌশল

মোস্তাফা জব্বার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতুন সরকার আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় একীভূত করেছে। এই মন্ত্রণালয়ের জন্য একজন পূর্ণ মন্ত্রী এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছেন। একে আমরা একটি শুভ সূচনা হিসেবে মনে করতে পারি। আমরা এর আগে আওয়ামী লীগকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ দেখেছি। এবার আওয়ামী লীগ আরও একধাপ এগিয়ে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আগে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হবে। আওয়ামী লীগের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে আমরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। উল্লেখ্য– 'কমপিউটার জগৎ, জানুয়ারি ২০১৪ সংখ্যায়' আমার লেখায় ইশতেহারের ৯.৩, ৯.৪, ১০.২, ১০.৩ অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবারের লেখাটি তারই সম্পূরক বলা যেতে পারে।

আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে এর নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। গত ২৮ ডিসেম্বর। যদিও দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচন নিয়ে দেশের মানুষের তেমন আগ্রহ ছিল না এবং পুরো বিষয়টি শেষাবধি শুধু নিয়মরক্ষার নির্বাচনেই পরিণত হয়েছিল, তথাপি ২০০৮ সালের পর আওয়ামী লীগ তার দেশ পরিচালনার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সামনের পাঁচ বছরের জন্য নতুন কী আপডেট দিল, সেই বিষয়ে অন্তত একাডেমিক আগ্রহ থাকতেই পারে। ইশতেহার নিয়ে আমাদের আলোচনাটি সেই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

২০০৮ সালে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছিল। সরকারের করণীয় অনেক বেশি স্পষ্ট ছিল। এবার সেই ধারাটি অব্যাহত নেই। মাত্র দুটি উপ-অনুচ্ছেদে তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিষয় বর্ণিত হওয়ার কথা নয়। সরকারের বহমান কার্যক্রমের কিছুটা বিবরণ ইশতেহারে থাকতে পারত। যাহোক, ইশতেহারে খুব সংক্ষেপে যেসব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সেগুলোর প্রায় সবই দৈনন্দিন কাজের কথা। হাইটেক পার্ক করা, সফটওয়্যার রফতানিতে সহায়তা করা, থ্রিজির পর ফোরজি চালু করা– এসব একটি সরকারের রুটিন কাজ। ক্ষমতায় থাকলে এসব রুটিন কাজ সরকারকে করতেই হবে। বরং সরকারের কোন কোন কাজ করা হয়ে গেছে, সেটি ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়নি। আওয়ামী লীগের জানা উচিত, ইতোমধ্যেই সরকার ফোরজির লাইসেন্স দেয়া শুরু হয়েছে এবং এটি চালু করা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা বলেছিল। বিগত পাঁচ বছর ধরে সেই কার্যক্রম সরকার অব্যাহত রেখেছে, সেহেতু এটি অব্যাহত থাকবে– এই কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটি নতুন করে বলা হয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে যে প্রশ্নটির উত্তর পুরো দেশের মানুষ খুঁজেছে সেটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে দলটি সাধারণ মানুষকে কী বোঝাতে চেয়েছে। সম্প্রতি সংসদ নির্বাচনের আগে প্রচারিত আওয়ামী লীগের কিছু নির্বাচনী বিজ্ঞাপন দেখে মানুষ এই ধারণা হয়তো করতে পারছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্থ হচ্ছে দ্রুত সেবা পাওয়া এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারা। কিন্তু সরকারের মন্ত্রী-নেতারা ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-দুর্নীতিমুক্ত বৈষম্যহীন যে দেশটির কথা বলেছেন, যাকে বঙ্গবন্ধুর একুশ শতকের সোনার বাংলা বলা হয়েছে, তার প্রতিফলন

পুরো ইশতেহারে হওয়া উচিত ছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান দিয়ে আমরা যেসব পরিবর্তনের কথা বলতে চেয়েছি সেটিও ইশতেহারে উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। ডিজিটাল শিক্ষা, ডিজিটাল সরকার, ডিজিটাল জীবনধারা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্পষ্ট করে কোনো বক্তব্য ইশতেহারে নেই।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ

আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে অনেক বড় একটি অঙ্গীকার রয়েছে। সেই অঙ্গীকারটি হলো বাংলাদেশ হবে একটি 'জ্ঞানভিত্তিক সমাজ' গড়ে তোলা হবে'। এই অঙ্গীকার করার সময় প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ কোন প্রত্যয়টি গভীরভাব ব্যক্ত করেছে, পুরো ইশতেহারের কোথাও এই বিষয়ে আর কোনো আলোচনা নেই। ইশতেহারের মেজাজেও এর কোনো প্রতিফলন নেই। কারও কারও মনে থাকতে পারে, সেই সময়ে ১০-১২ ডিসেম্বর জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি সমাজ সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান যোগ দিয়েছিলেন এবং এরা ২০০৬ সালের মাঝে বাংলাদেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে এসেছিলেন। এরা বিশ্ববাসীর সাথে একটি অঙ্গীকারনামায়ও সম্মত হয়েছিলেন। জাতিসংঘ যেখানে ২০১৫ সালে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার কথা বলেছিল, সেখানে বেগম জিয়া ২০০৬ সালেই সেই সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বাস্তবায়ন ঘটেনি।

ডিজিটাল বিপ্লব হচ্ছে শিল্পযুগোত্তর একটি কর্মসূচি। তথ্যপ্রযুক্তিই এই যুগের সূচনা করেছে এবং তথ্যপ্রযুক্তিই এর মূল চালিকাশক্তি। বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ২০০৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলনে ঘোষণা : 'We, the representatives of the peoples of the world, assembled in Geneva from 10-12 December 2003 for the first phase of the World Summit on the Information Society, declare our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the Universal Declaration of Human Rights.'

বিশ্ববাসীর এ ঘোষণা থেকে কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে যদি চিহ্নিত করা হয়। এর একটি গণকেন্দ্রিকতা, সবাইকেই সম্পৃক্ত করার উন্নয়নমুখী তথ্যসমাজ– যেখানে প্রতিটি মানুষের সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ থাকবে, তথ্য ও জ্ঞানে অবাধ প্রবেশাধিকার পাবে, এগুলো ব্যবহার করতে পারবে এবং অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে পারবে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের ইশতেহারে নতুন করে আওয়ামী লীগ, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার অঙ্গীকার দিয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, সেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজটা কেমন করে গড়ে উঠতে পারে। এর স্বরূপ, প্রকৃতি, প্রভাব ও বাস্তবায়ন কৌশল জানাটাও খুবই জরুরি। আলোচনায় আসতে পারে এর বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে।

উইকিপিডিয়ায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজকে বর্ণনা করা হয়েছে : 'A knowledge society generates, processes, shares and makes available to all members of the society knowledge that may ▸

be used to improve the human condition.'

অর্থাৎ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সমাজের সবার পাওয়ার উপযোগী জ্ঞান সৃষ্টি, প্রক্রিয়াজাত, বিনিময় করে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজের আরও একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায় বিশ্ব বিজ্ঞান-ফোরামের ওয়েবসাইটে। সেখান বলা আছে : 'A knowledge-based society is an innovative and life-long learning society, which possesses a community of scholars, researchers, engineers, technicians, research networks, and firms engaged in research and in production of high-technology goods and service provision. It forms a national innovation-production system, which is integrated into international networks of knowledge production, diffusion, utilization, and protection. Its communication and information technological tools make vast amounts of human knowledge easily accessible. Knowledge is used to empower and enrich people culturally and materially, and to build a sustainable society.'

সাইটটিতে খুব স্পষ্ট করে বলা আছে, প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানকে সীমিত করে বন্দী করে রাখা হতো। জ্ঞানভিত্তিক সমাজে সেই ব্যবস্থার বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি করছে। সাইটটিতে আরও বলা হয়, In a knowledge-based society 1) all forms of knowledge (scientific, tacit, vernacular, embedded; practical or theoretical, multisensorial or textual, linearly/hierarchically organized or organized in network structures) are communicated in new ways; 2) as the use and misuse of knowledge has a greater impact than ever before, equal access to knowledge by the population is vital; 3) information accessibility should not be a new form of social inequality; 4) closing the growing gap between developed and developing countries must be a top political priority– no one can be left behind; 5) as knowledge cannot be understood without culture, research on the interface between vernacular and scientific knowledge must be developed; 6) access to knowledge should be considered as a right and should be protected from short-term industrial interests limiting this access; 7) there must be a continuous dialogue between society and science, thus promoting scientific literacy and enhancing the advising role of science and scholarship; 8) scientific discourse should stop being gender-blind, barriers that prevent more women from choosing science careers and reaching top positions should be overcome; 9) the young generation's interest in science and commitment to the knowledge-led future of their countries should be stimulated by introducing innovative teaching methods, and by changing the image of the scientist, with the help of the media and through involved mentorship.

বস্তুতপক্ষে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করার সুযোগ আছে। আইটিইউ'র তথ্যসমাজ সম্মেলন থেকে শুরু করে আজকের ডিজিটাল রূপান্তর পর্যন্ত সব বিষয়ই এর আওতায় আসবে। একই সাথে ২০০৩ সালের তথ্যসমাজ ঘোষণা থেকে শুরু করে এই সমাজ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান সূচনার পরের পাঁচ বছরে পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক ছিল আইসিটি। কথাটি বাংলাদেশের জন্যও প্রযোজ্য। পাঁচ বছর আগের বাংলাদেশকে আইসিটি ব্যাপকভাবে বদলে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পর্যন্ত– সব ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে ডিজিটাল প্রযুক্তির পরশ। পাঁচ বছরে আমরা আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারতাম। হয়তো আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশি ছিল। অনেক অপূর্ণতার কথাও বলা যাবে। তবে সেসব প্রত্যাশা পূরণের কথা বলার আগে ভাবতে হবে, শত শত বছরের প্রাচীন একটি আমলাতন্ত্র বহাল রেখে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে ডিজিটাল যুগের পথে আমাদের পক্ষে কতটা সামনে যাওয়া সম্ভব ছিল। আর সেজন্যই আমাদের প্রত্যাশার পুরোটা পূরণ না হলেও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে আমরা পিছিয়ে পড়িনি। বরং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান দিয়ে আমরা দেশের সব মানুষের কাছে এর অপরিহার্যতা প্রকাশ করতে পেরেছি এবং এই ধারণাটি সাধারণ মানুষের কাছেও ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো– 'সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ, যা সব ধরনের বৈষম্যহীন, প্রকৃতপক্ষেই সম্পূর্ণভাবে জনগণের রাষ্ট্র এবং যার মুখ্য চালিকাশক্তি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমরা ২০১৪ সালে এসে একটু ব্যাখ্যা করতে চাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে কেমন করে বাংলাদেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। আলোচ্য বিষয় প্রধানত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কৌশল। এর ফলে আমরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে আরও একটি ধাপ অতিক্রম করব।

কৌশল

আমাদের সবকিছুর ডিজিটাল রূপান্তরের যে লক্ষ্য, এর জন্য প্রধানত চারটি কৌশলকে চিহ্নিত করা যায়, যার মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকবে মানবসম্পদ বিষয়ে। এরপর ডিজিটাল সরকার, ডিজিটাল জীবনধারা ও জন্মের অঙ্গীকারে রাষ্ট্র গড়ে তোলার বিষয়টি থাকবে।

আমাদের কৌশলের সংখ্যা আরও অনেক ▸

অভিজ্ঞতায় পাওয়া চ্যালেঞ্জ

বিগত পাঁচ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে গিয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, তার সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা। বিদ্যমান আমলাতন্ত্র কৃষি যুগের ধারণায় ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পরিচালিত হয়। একই সাথে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বেশিরভাগই ডিজিটাল যুগ গড়ে তোলার ধারণা অনুধাবনে অক্ষম। যাদের ওপর নির্ভর করে ডিজিটাল যুগ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাদের মাঝেও বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রস্তাব হচ্ছে : ০১. আমলাতন্ত্রকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে সম্যক ধারণা দিতে হবে এবং তাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর হিসেবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটি স্পষ্ট করে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। ০২. রাজনীতিবিদদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। ০৩. জনগণকে, বিশেষত নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং সেভাবেই তাদের উপলব্ধিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উপযুক্ত করতে হবে। ০৪. ডিজিটাল বাংলাদেশকেন্দ্রিক সচিবালয় গড়ে তুলতে হবে এবং সেখান থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সব কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করতে হবে। ডাক, তার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে সেই দায়িত্ব দিতে হবে এবং ০৫. সরকারপ্রধানকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মকাণ্ডের সর্বময় সমন্বয় করতে হবে। তবে মন্ত্রণালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবে।

বস্তুত ২০১৮ সালের মধ্যেই আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হবে। বিগত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সেটি আমাদের পক্ষে করাও সম্ভব। যদিও পুরো কাজটির জন্য আমাদের সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তথাপি যে জাতি নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, সেই জাতি সামনের পাঁচ বছরের মধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশও গড়তে পারবে। তবে ২০১৮ সালে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা হয়তো দেখতে পাব যে, কিছু কিছু কাজের শেষাংশ বাকি রয়েছে। আমাদের ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা আছে বলে ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ হবে আমাদের অবশিষ্ট ছোট কাজগুলো সম্পন্ন করার সময়। ২০২০ সালে যখন এই জাতি তার পিতার শততম জন্মবার্ষিকী পালন করবে, তখন একবার হিসাব মেলাবে এবং মূল্যায়ন করবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আর কতটা বাকি এবং তার পরের বছর যখন এই জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে, তখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জয়ন্তীও উদযাপন করবে।

হতে পারে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই চারটি বিষয়কে যদি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রধান কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে যাবে।

কৌশল-১ : ডিজিটাল রূপান্তর ও মানবসম্পদ : পাঁচটি ধারায় এই রূপান্তরের মোদ্দা কথাটা বলা যায়।

প্রথমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিশু শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ৫০ নাম্বার হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির মান হতে হবে ১০০। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ইংরেজি-বাংলা-আরবি মাধ্যম নির্বিশেষে সবার জন্য এটি অবশ্যপাঠ্য হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য একটি করে কমপিউটার হিসেবে কমপিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে হবে। এই কমপিউটারগুলো শিক্ষার্থীদেরকে হাতে-কলমে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখাবে। একই সাথে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে নিজেরা এমন যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হতে পারে, রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মাঝে আনতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রতিটি ক্লাসরুমকে ডিজিটাল ক্লাসরুম বানাতে হবে। প্রচলিত চক, ডাস্টার, খাতা-কলম-বইকে কমপিউটার, ট্যাবলেট পিসি, স্মার্টফোন, বড় পর্দার মনিটর/টিভি বা প্রজেক্টর দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। প্রচলিত স্কুলের অবকাঠামোকে ডিজিটাল ক্লাসরুমের উপযুক্ত করে তৈরি করতে হবে।

চতুর্থত, সব পাঠ্য বিষয়কে ডিজিটাল যুগের জ্ঞানকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযোগী পাঠক্রম ও বিষয় নির্ধারণ করে সেসব কনটেন্টকে ডিজিটাল কনটেন্টে পরিণত করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়নকেও ডিজিটাল করতে হবে। কনটেন্ট যদি ডিজিটাল না হয়, তবে ডিজিটাল ক্লাসরুম অচল হয়ে যাবে। এসব কনটেন্টকে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারেক্টিভ হতে হবে।

পঞ্চমত, সব শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

এই পাঁচটি ধারার বিস্তারিত কাজগুলোতে আরও এমন কিছু থাকবে, যা আমরা এখানে উল্লেখই করিনি। সেইসব কাজসহ ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সব কাজ ২০১৪-১৮ সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

কৌশল-২ : ডিজিটাল সরকার : আমরা ডিজিটাল সরকার গড়ে তোলার কিছু কৌশলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।

প্রথমত, সরকারি অফিসে কাগজের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করতে হবে। সরকারের সব অফিস, দফতর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় কাগজকে ডিজিটাল পদ্ধতি দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। এজন্য সরকার যেসব সেবা জনগণকে দেবে, তার সবই ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে হবে। এখানেও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি দফতরের বিদ্যমান ফাইলকে ডিজিটাল ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করতে হবে। নতুন ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সংরক্ষণ ও বিতরণ করতে হবে। সংসদকে ডিজিটাল হতে হবে। বিচার বিভাগকে কোনোভাবেই প্রচলিত রূপে রাখা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, সরকারের সব কর্মচারী-কর্মকর্তাকে ডিজিটাল যন্ত্র দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে জানতে হবে। নতুন নিয়োগের সময় একটি বাধ্যতামূলক শর্ত থাকতে হবে যে, সরকার যেমন ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করবে, সরকারে নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে সেই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারতে হবে।

তৃতীয়ত, সব সরকারি অফিসকে বাধ্যতামূলকভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে হবে এবং সব কর্মকাণ্ড অনলাইনে প্রকাশিত হতে হবে।

চতুর্থত, সরকারের সব সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য জনগণের দোরগোড়ায় সেবাকেন্দ্র থাকতে হবে।

পঞ্চমত, জনগণকে সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রযুক্তি ব্যবহারকে সব সুযোগ দিতে হবে। থ্রিজির প্রচলন এই বিষয়টিকে সহায়তা করলেও এর ট্যারিফ এবং সহজলভ্যতার চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হবে। সারাদেশে বিনামূল্যের ওয়াইফাই ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।

কৌশল-৩ : ডিজিটাল জীবনধারা : ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে ডিজিটাল জীবনধারা গড়ে তোলা। দেশের সব নাগরিককে ডিজিটাল যন্ত্র-প্রযুক্তি দিয়ে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে এবং তার চারপাশে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে তার জীবনধারাটি ডিজিটাল হয়ে যায়। সাথে বেসরকারি ব্যবসায়-বাণিজ্য, সেবাকে ডিজিটাল করা হলে দেশের মানুষের জীবনধারা ডিজিটাল হয়ে যাবে। এই কৌশলের জন্যও পাঁচটি কর্মপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। ০১. কথা উল্লেখ করছি। ০১. দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কমপক্ষে ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ সুলভ হতে হবে। দেশের প্রতিইঞ্চি মাটিতে এই গতি নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। ০২. দেশের সব সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি অফিস-আদালত, শহরের প্রধান প্রধান পাবলিক প্লেস, বড় বড় হাটবাজার ইত্যাদি স্থানে ওয়াইফাই ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ০৩. রেডিও-টিভিসহ বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সব ব্যবস্থা ইন্টারনেট-মোবাইলে প্রাপ্য হতে হবে। ০৪. ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা, কৃষি, স্বাস্থ্য সেবা, আইন-আদালত, সালিশ, সরকারি সেবা, হাট-বাজার, জলমহাল, ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করতে হবে এবং ০৫. প্রচলিত পদ্ধতির অফিস-আদালত-শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

দেশটা ডিজিটাল হলো কি না তার প্যারামিটার কিন্তু ডিজিটাল জীবনধারা দিয়েই দেখতে হবে। ফলে এই কৌশলটির দিকে তাকিয়েই আমরা অনুভব করব কতটা পথ হেঁটেছি আমরা কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

জরুরি করণীয়

বিগত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে সরকারের এই মুহূর্তে জরুরি কিছু করণীয় রয়েছে। আমরা সবাই জানি, নতুন সরকারের প্রথম করণীয় হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এরই মাঝে এই পথে সরকার যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। একই সাথে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সঙ্কট দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য খাতের মতোই এই খাতেও সহায়তা দিতে হবে।

তবে কয়েকটি কাজ অতি জরুরিভাবে করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি। সম্ভব হলে সরকার গঠনের শুরু এই কাজগুলো করা যেতে পারে। ০১. আইসিটি নীতিমালা নবায়ন করতে হবে। এটি অনেক আগেই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিগত সরকারের শেষের বছরগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার জন্য সেটি নবায়ন হয়নি। একইভাবে কমপিউটারে বাংলাভাষার প্রমিতকরণের কিছু কাজও আটকে আছে। আটকে আছে বাংলাভাষা উন্নয়নের কিছু প্রকল্প। ০২. দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ল্যাব তৈরির স্থগিত কাজ আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। ০৩. ডিজিটাল সরকার প্রকল্প বস্তুত নেই। ওয়েবসাইট তৈরি আর নেটওয়ার্ক প্রকল্প দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। বস্তুত এখনও জোড়াতালির পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ চলছে। একটি পরিকল্পিত পথ ধরে ডিজিটাল সরকারের কাজ করতে হবে। ০৪. জনতা টাওয়ার, মহাখালী, কালিয়াকৈরসহ দেশের অন্যান্য স্থানে যেসব হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে, সেগুলোকে বাস্তবায়নের বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। ০৫. ইন্টারনেটের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে ইন্টারনেট দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ০৬. চলমান প্রকল্পগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

সার্বিকভাবে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার যে, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলাটি বস্তুত সভ্যতার বিবর্তন ও যুগ পরিবর্তন। কাজটি খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। ডিজিটাল রূপান্তর হচ্ছে তেমন একটি সমাজ গড়ে তোলার প্রধান সিঁড়ি। কিন্তু জ্ঞানভিত্তিক সমাজের সাথে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক-রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে। এখন থেকেই সেইসব বিষয় নিয়েও আমাদেরকে ভাবতে হবে।